বাংলায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভিত্তি: কিছু প্রাথমিক ভাবনা

সাম্প্রদায়িক রাজনীতি মোকাবিলায় শ্রেণী ও ভাষার ভিত্তিতে রাজনীতির গুরুত্ব আলোচনা করলেন **মইদুল ইসলাম।**

ধর্মীয় মৌলবাদীরা মানুষের কানে কুমন্ত্রণা দেওয়ার কাজে নেমে পড়েছে। ধর্মের নামে বিভেদ সৃষ্টি করে গুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে শ্রেণী ও ভাষার মতো কিছু মৌলিক বিষয়। মানুষ ধনী, মধ্যবিত্ত না গরীব অথবা পুঁজিপতি, কৃষক না শ্রমিক পরিবারে জন্মেছে— কেবলমাত্র একটা নির্দিষ্ট পরিবারে জন্মাবার কারণেই কিছু অধিকার সে জন্মসূত্রে পায় বা বঞ্চিত হয়। আবার জন্মাবার পরে ভাষা না শিখলে তো সে ধর্মের কথা ভাবতে পারবে না। 'গড', 'ঈশ্বর', 'ভগবান', 'খুদা', 'আল্লাহ' বলতে গেলে, কোনও ধর্মগ্রন্থ পড়তে গেলে বা ধর্মচর্চা করতে গেলে তো হয় মাতৃভাষা বা অন্য কোনও একটা ভাষা শিখতে হয়। ধর্ম এমন একটি আধিপত্যবাদী নির্মাণ যা শিশু অবস্থায় মজ্জাগত করা হয়। ভবিষ্যতে শিশু কোন ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে বাঁচবে তা অনেকটাই সেই শিশুর পিতা-মাতার ধর্মীয় পরিচয়ের উপর নির্ভর করে বা অনাথ শিশুর ক্ষেত্রে সে কোন ধর্মীয় অবয়বের মধ্যে বড় হচ্ছে তার উপরে নির্ভরশীল। অথচ সেই যুক্তিতে কিন্তু আমরা হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান, জৈন, বৌদ্ধ, পারসী ইত্যাদি বলার পরিবর্তে 'কংগ্রেস শিশু', 'কমিউনিস্ট শিশু', 'আরএসএস শিশু' বা 'উদার শিশু', 'বামপন্থী শিশু', 'রক্ষণশীল শিশু' বলি না, সেই শিশু ওরকম একটি পরিবারে জন্মালেও। ভবিষ্যতে ঐ শিশু বড় হয়ে কিন্তু তার ধর্ম পরিবর্তন করতে পারে, অন্য ধর্ম গ্রহণ করতে পারে বা যে কোনও ধর্ম সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে, স্রষ্টা নেই বলে নাস্তিকও হতে পারে। কিন্তু সেই শিশু জন্মসূত্রে পাওয়া বা না পাওয়া শ্রেণীগত সুযোগ-সুবিধা এবং তার মাতৃভাষাকে অস্বীকার করতে পারেন না বললেই চলে। আজ বিশ্বায়নের যুগে ভারতের মতো উত্তর-ঔপনিবেশিক দেশে যদিও এক শ্রেণীর শিশু আবার মাতৃভাষায় স্বচ্ছন্দ নয়। ইংরেজি তাদের প্রথম ও শেষ ভাষা। তাই মাকে 'মামি' আর বাবাকে 'ড্যাডি' বলে বড় হচ্ছে। তাহলেও সে ঐ বিলেতি ভাষায় বড় হচ্ছে তো কেবল একটা বিশেষ শ্রেণীগত অবস্থানের জন্যই। অর্থাৎ শ্রেণী ও ভাষা, ধর্মের ভাবনার থেকে অনেক বেশি মৌলিক। কিন্তু ধর্মীয় মৌলবাদীরা ধর্মের পরিচিতিকে শান দিয়ে বাকি পরিচয়গুলোকে ভুলিয়ে দিতে চায়। সত্যজিৎ রায়ের 'আগন্তুক' মনমোহন মিত্র তাই অনেক ভেবেচিন্তে এই বক্তব্য রেখেছিলেন— "যে জিনিস মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে, আমি তাকে মানি না। রিলিজিওন (ধর্ম) এটা করেই আর 'অরগানাইজড রিলিজিওন' (সংগঠিত ধর্ম) তো বটেই।" দুই বাংলার ইতিহাস সাক্ষী যে শ্রেণী ও ভাষার ভিত্তিতে রাজনীতি এহেন ধর্মীয় রাজনীতির মোকাবিলা করতে পারে।

বাংলা ভাগ মূলত বাঙালিরা করেনি। জিন্নাহ, গান্ধী, নেহরু বাঙালি ছিলেন না। দিল্লী, বোম্বাই ও গুজরাটের নেতাদের বাংলা ভাগ চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে এবং ঐক্যবদ্ধ বাংলার পক্ষে শরৎচন্দ্র বসু, হুসেন শহীদ সুহরাবার্দি, কিরণশংকর রায়, আবুল হাশিম, সত্যরঞ্জন বক্সী এবং মহম্মদ আলী চৌধুরীর মতো বাঙালি জাতীয়তাবাদী নেতারা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রের পক্ষে মত দেন। শরৎ বসু তো একটা 'সার্বভৌম সমাজবাদী প্রজাতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার কথাও বলেছিলেন। বাংলা ভাগ জমিদার ও বড় ব্যবসায়ীদের সম্মিলিত শাসক শ্রেণীর একটা বড় অংশ এবং মধ্যবিত্তের একাংশ চাইলেও, তা গরীব মানুষ তথা বাংলার শ্রমিক ও কৃষক কিন্তু চায়নি। গরীব ও মেহনতি মানুষের একতা ভাঙতে ধর্মের কারবারীদের সাহায্য নেওয়া হয়। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা লাগানো হয়। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার সেই অগৌরবের ইতিহাস তো আমরা ভুলে যেতে পারি না। সাম্প্রদায়িক ইতিহাসের উত্তরাধিকারী হয়েও পশ্চিমবঙ্গে, শ্রমিক-কৃষকের লড়াকু রাজনীতি এবং পূর্ববঙ্গে, কৃষিজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের একত্র করে, বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতি কিন্তু ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে টক্কর দিতে পেরেছিল।

বাংলাদেশে যেমন ধর্মীয় মৌলবাদীদের ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হচ্ছে বা আমৃত্যু কারাদণ্ডে পচানো হচ্ছে, আমাদের 'মহান' 'ধর্মনিরপেক্ষ' ভারত রাষ্ট্রে যেসব আরএসএস কর্মীরা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত এবং নান্দেদ, মালেগাঁও, হায়দরাবাদের মক্কা মসজিদ এবং সমঝোতা এক্সপ্রেসে বোমা বিস্ফোরণের মতো ঘটনায় অভিযুক্ত, তাদের সকলকে ওরকম কঠিন শাস্তি দিতে কোন দিন পারবো? বাংলাদেশে ধর্মের নামে রাজনীতি করা দল, জামাত-এ-ইসলামি ১২ শতাংশের বেশি কোনও দিন ভোট পায়নি। সংখ্যাগুরু মানুষের সমর্থন তো দূরে থাক। বাংলাদেশ সংসদীয় নির্বাচনের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত, জামাত কোনও দিন ৩০০-র মধ্যে ১৮-টার বেশি আসন পায়নি। অথচ আমাদের 'মেরা ভারত মহান' শ্লোগান তোলা 'ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে' ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের নামে শুধু ৩১ শতাংশ মানুষের সমর্থনই জোটে না, বরং সংখ্যাগুরু আসন পেয়ে এমন একজন প্রধানমন্ত্রী হয় যিনি ২০১৩ সালেও এক সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে, সংখ্যালঘু মানুষকে 'কুকুর শিশুর' সঙ্গে তুলনা করতে বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত হন না। তবে বাংলাদেশে যে সব কিছু ঠিকঠাক চলছে এমন নয়। ওখানে চিটাগাং-এর আদিবাসীরা, বিহারীরা এবং হিন্দু সংখ্যালঘুদের একাংশ প্রান্তিক জীবনযাপন করছে, বেশ কিছু অভাব অভিযোগ

নিয়ে। সেটা বাংলাদেশের কাছে মোটেই গৌরবের বিষয় নয়। তাই মোল্লাতন্ত্রের বিরুদ্ধে শাহবাগের মতো যে ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ জোরদার আন্দোলন করে, তাদেরকে বাংলাদেশের আদিবাসী, বিহারী ও হিন্দু সংখ্যালঘুদের গণতান্ত্রিক দাবিগুলোকে নিয়েও আন্দোলন করা উচিত।

গত দেড় দশকে বেশ কিছু নয়া উদারবাদী নীতির পক্ষে কয়েকটা বাম রাজনৈতিক দল যারা বামফ্রন্ট সরকার চালিয়েছিল, তারা সওয়াল করেছে। তারা চীনের মডেলের দিকে তাকিয়েছিল। এমন একটা চীনা মডেল যা মার্কসবাদী তাত্ত্বিক ডেভিড হার্ভে 'চীনা বৈশিষ্ট্যের নয়া উদারবাদ' বলে অভিহিত করেছেন। মাঝে মাঝে বামফ্রন্টের প্রধান শরিক দল আবার 'গুজরাট মডেলে'র কথাও বলছিল। সেই গুজরাট মডেলও অনেকাংশে চীনা মডেলের অনুকরণ। আসলে 'বিকল্পের সন্ধানে' কোনও অভিনব বামপন্থী উন্নয়নের ভাবনা ছিল না। বামফ্রন্ট সরকারের কাছে মানুষ যে খুব একটা বিপ্লবী কিছু আশা করেছিল তা কিন্তু নয়। মানুষ একটা সমাজ কল্যাণমূলক সরকার আশা করেছিল। ভেবেছিল যে সত্তরের দশকের শেষের দিকে ও আশির দশকের ভূমি সংস্কার ও পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের যে ক্ষমতায়ন হয়েছিল যে শহরের শ্রমিক শ্রেণী যে গলার জোর পেয়েছিল, পরবর্তীকালে অন্যান্য মৌলিক উন্নয়নের বিষয়গুলিতে বামফ্রন্ট সরকার মন দেবে। কিন্তু নব্বই দশকের শেষ দিক থেকে বামফ্রন্ট ক্রমেই পুঁজির কাছে নতিস্বীকার শুরু করল। শ্রমিক নেতারা অনেকে শ্রমিক স্বার্থের কথা না ভেবে নিজেদের ঘর গোছানোর কথা ভাবতে শুরু করলেন। অন্য দিকে বড় পুঁজিকে নিমন্ত্রণ করার নামে নিমন্ত্রণকারী বামফ্রন্ট সরকার, নিমন্ত্রিত পুঁজিবাদীদের জন্য বিভিন্ন প্রকারের উপঢৌকনের ব্যবস্থা করতে উদ্যত হয়েছিল। বামফ্রন্ট সরকারের শেষ দশকে তো শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো সমাজ কল্যাণের খাতে বাজেটে উল্লেখযোগ্যভাবে বরাদ্দ কমেছিল।

এর ফল হল এই যে ২০১১ সালের আদমসুমারিতে বিদ্যুৎ ব্যবহার, পরিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবহার, ব্যাঙ্কিং পরিষেবার সুবিধা ও টেলিভিশন ব্যবহারের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় গড়ের চেয়ে বেশ পিছনে পড়ে থাকল। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে নয়া উদারবাদী পথে চলতে গিয়ে বামফ্রন্ট মানুষের সমর্থন হারাল। সেইসব পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ফেটে পড়ল জমি অধিগ্রহণের সময়ে। মানুষ বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে পথে নামল ও নির্বাচনে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে ভোট দিল। পশ্চিমবঙ্গে তাই দক্ষিণপন্থী মতাদর্শ রাজনীতির ময়দানে আগেই জমি পেয়েছিল। তার সাথে যোগ হল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ধর্ম ও কুসংস্কারের আগের থেকে সমাজের উপর একটু বেশি প্রভাব। আমাদের রাজ্যে বেশ কয়েক বছর ধরে জ্যোতিষচর্চার নামে কিছু ভণ্ড লোক, সাধারণ মানুষের ভাগ্য নির্ধারণের রমরমা ব্যবসা করছে। বেশ কয়েক বছর হল অনেকগুলো টিভি চ্যানেল কেবল জ্যোতিষ ও ধর্মগুরুদের জন্য চব্বিশ ঘণ্টা প্রচার করে। আবার খবরের চ্যানেল ও দৈনিক কাগজ এইসব জ্যোতিষী ও ধর্মগুরুদের বিজ্ঞাপনের দ্বারা পুষ্ট। পুঁজিবাদ এক সময় ধর্মীয় ও অন্যান্য কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুক্তি নির্ভরতাকে জায়গা দিয়েছিল। কিন্তু একই সঙ্গে ধর্ম ও বিভিন্ন প্রকারের কুসংস্কারকে একেবারে বাতিল করেনি। বরঞ্চ ঐসব অযৌক্তিক ধারণাগুলোর দরজা বন্ধ না করে সময় মতো মানুষকে ভুল বোঝানোর রাস্তা খোলা রাখে। পুঁজিবাদ বিভিন্ন দাবিতে মানুষের লড়াইকে বানচাল করতে ধর্ম ও কুসংস্কারকে ব্যবহার করে। তাই পুঁজিবাদের মধ্যে একই সঙ্গে যুক্তিনির্ভর বিজ্ঞান এবং অযৌক্তিক কুসংস্কার পণ্য হয়। এই রাজ্যে সেই নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম হচ্ছে না।

অন্য দিকে বিজ্ঞান ও যুক্তিচর্চার মঞ্চগুলো আজ জনসমক্ষে খুব একটা দেখা যায় না। কলকাতা শহরের মধ্যে সামাজিক পরিচয়ের ভিত্তিতে অনেক দিন ধরে যে বিভাজন তৈরি হয়েছে সেগুলিকে যেন আরও বেশি করে লালনপালন করা হচ্ছে বিশ্বায়নের জমানায় 'গেটেড কমিউনিটি'র মাধ্যমে। খিদিরপুর-একবালপুর-মোমিনপুর-মেটিয়াব্রুজ এর মানুষ তাঁদের এলাকায় বাজার হাট করেন। আবার গড়িয়াহাট-যাদবপুর-বেহালা-ভবানীপুরের বহু বাসিন্দা একবালপুর-মোমিনপুরের অলিগলি চেনেন না বললেই চলে। তেমনই পার্ক সার্কাস-তোপসিয়ার আর ক'জন বাসিন্দা শ্যামবাজার-বাগবাজারের রকে বসে বা নিদেন পক্ষে সিঁথির চা দোকানে আড্ডা মেরেছেন? পশ্চিমবঙ্গের শহর ও মফঃস্বল থেকে প্রত্যেক বছর গ্রীষ্ম অথবা পুজোর ছুটিতে মানুষ ভিন রাজ্যের সিমলা, পুরী, গোয়া, আগ্রা, উটি ইত্যাদি জায়গায় বেড়াতে যান। এই লেখকের এক অধ্যাপক বন্ধু, সম্প্রতি এক খবরের কাগজে লিখেছেন যে এক বছর একটু প্রতিবেশী ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, চিটাগাং ঘুরে আসার কথা কি ভাবতে পারি না? অযৌক্তিক বাংলা ভাগ যা ঋত্বিক ঘটক বা পাকিস্তানের ক্ষেত্রে সাদাত হাসান মান্টো মন থেকে কখনও মেনে নিতে পারেননি, সেই আজকের বিদেশ, কিন্তু কয়েক দশক আগে যে একই দেশ ছিল, সেই সব জায়গায় মানুষ কেমন আছেন, তা কি দেখতে পারি না? এখন তো বাংলাদেশে যাওয়ার ছাড়পত্র পাওয়া ও যাতায়াত করা অনেক সহজ হয়ে গেছে। এই ধরনের যাওয়া আসা, ভ্রমণবিলাসের মাধ্যমেই তো এক গোষ্ঠীর মানুষ অন্য গোষ্ঠীর মানুষকে চিনতে শিখবে। একে অপরকে আরও বেশি জানতে ও বিশ্বাস করতে শিখবে।

তালিবানরা আফগানিস্তানের বামিয়ানে যেভাবে বুদ্ধমূর্তি ধ্বংস করার মতো ঘৃণ্য, জঘন্য ও কুৎসিত কাজ করেছিল ঠিক একইরকমভাবে অন্য ধর্মস্থান ও তার নান্দনিক সৌধ এবং কীর্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করে তালিবানদের কুকর্মের কয়েক বছর আগেই সংঘ পরিবারের সক্রিয় কর্মীরা বাবরি মসজিদ ধ্বংস করেছিল। বাংলার এক জনপ্রিয় বাম মুখ্যমন্ত্রী এক সময় সেইসব সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক কারবারীদের 'অসভ্য' ও 'বর্বর' বলতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত ও অনুতপ্ত হননি। ঐ উক্তি করে উনি এক বিজেপি নেতাদের সঙ্গে আশির দশকে, কলকাতার ময়দানে হাত ধরে সভা করার পুরনো ভুল অনেকটা শুধরে নিয়েছিলেন। তাই পরবর্তীকালে

তিনি সুস্পষ্ট ও দ্বিধাহীন ভাষায় বলেছিলেন যে যারা বাবরি মসজিদের মতো ধর্মস্থান ধ্বংস করে এবং মুসলিম ও খ্রিস্টান সংখ্যালঘুদের হত্যা করে, তাদেরকে 'অসভ্য' ও 'বর্বর' বলা ছাড়া অভিধানে অন্য কোনও শব্দ খুঁজে পাননি। এহেন বাম নেতার উত্তরসূরীদের কাছে তো আরও চরম বিজেপি বিরোধিতা আশা করছেন মানুষ।

এগুলো যখন হয় না তখন বাঙালিকে হিন্দু-মুসলমানের নামে ভাগ করার অপচেষ্টায় উদ্যত হয় কিছু দিল্লী-গুজরাটের নেতারা। আর দুর্ভাগ্যক্রমে তাদের দলে ভিড়ে যায় কিছু বঙ্গজ সন্তান। এহেন কুকাজ স্বাধীনতার আগেও হয়েছে। আজ আবার তার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। তাই 'উন্নয়ন', 'অধিকার' এবং 'জীবিকার' মতো চেনা রাজনীতির রাজপথ ছেড়ে অচেনা অলিগলি ধরে (মুসলিম) 'অনুপ্রবেশ' আর (হিন্দু) 'শরণার্থী' নামক, আগে পাত্তা না পাওয়া কিছু রাজনৈতিক শব্দবন্ধ আবার উচ্চারিত হতে শুরু করেছে। ভাবটা এমন, 'অভিবাসন' (immigration) বলে যে একটা আইনি শব্দবন্ধ আছে তা যেন বিশেষ একটা উচ্চারিত না হয়। কারণ, তাহলে সঙ্গত প্রশ্ন উঠবে যে ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় যারা আসেন, তাঁদের বৈধ 'অভিবাসন' দেওয়ার মূল দায়িত্ব কার? প্রশ্ন উঠতে পারে যে রুটি-রুজি, কর্মক্ষেত্র, আত্মীয়তার সূত্রে অথবা এক দু'জন যদি কোনও অবৈধ কার্যকলাপের অভিসন্ধি নিয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসে, তাদের বৈধ অভিবাসনের ব্যবস্থা করা ও দেশীয় সীমানা পারাপারের দেখভাল করা, কাদের দায়িত্ব? যথারীতি দিল্লীর মন্ত্রী-সান্ত্রীরা ও কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন প্রতিরক্ষার দায়িত্বে থাকা অফিসাররা এক্ষেত্রে নিজেদের দায়িত্ব একদম ঝেড়ে ফেলতে পারেন না। সীমান্ত এলাকায় ঘুষ ও উপঢৌকনের বিনিময়ে কিভাবে বেআইনি পারাপার হয়, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা ও কাস্টমস অফিসারদের চোখে ধুলো দিয়ে অথবা পকেটে টাকা গুঁজে দিয়ে চোরাকারবারি থেকে শুরু করে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালানোর যে অপচেষ্টা হয়, সেই নিয়েও আজকাল গবেষণা হচ্ছে। অভিবাসন কেন্দ্রিক রাজনীতি ইউরোপ ও আমেরিকাতেও হয়। সেই রাজনীতির পক্ষে-বিপক্ষের যুক্তিগুলো মূলত সামাজিক-অর্থনৈতিক বিপন্নতা (যেমন বিদেশিরা চাকরি নিয়ে নিচ্ছে ও সন্ত্রাসবাদের ভয়) থেকে বর্ণবিদ্বেষের চেহারা নেয়। এ রাজ্যে হিটলারের স্বস্তিকা প্রেমী অমানুষরা এই অভিবাসনের রাজনীতির নামে আসলে বেআইনি কথাবার্তা বলে সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী রাজনীতি করাতেই মনোনিবেশ করছে।

শ্রেণী ও ভাষাগত ঐক্য ভাঙতে ধর্মীয় মৌলবাদীরা ধর্মের শরণাপন্ন হয়। তাই ভিএইচপি-আরএসএস-বিজেপি নেতারা 'আমরা সবাই হিন্দু' এবং 'ভারত একটা হিন্দু রাষ্ট্র'র মতো কিছু অসাংবিধানিক বক্তব্য জনসমক্ষে রাখছে। ঐসব দলগুলোর বিরুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত করার পুরনো অভ্যেস বা গুজরাটের মতো গণহত্যায় হাত পাকাবার গুরুতর অভিযোগ আছে। তারা আজ এই রাজ্যেও আগের থেকে অনেক বেশি সোচ্চার। অন্যদিকে ১৯৯৮ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত, বাংলায় বিজেপির মতো একটি সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ট দলের সঙ্গে আঁতাত করে লোকসভা ও বিধানসভা মিলিয়ে চার চারটে নির্বাচন লড়ে তৃণমূল এখন ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী হওয়ার চেষ্টা করছে। এখন তারা আবার কিছু মৌলবিদের তোল্লাই দিচ্ছে। ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের, সরকারি কোষাগার থেকে ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। ঐ ভাতার কোনও সাংবিধানিক ভিত্তি আছে কি না বা অন্য সাধারণ গরীব মুসলমানদের ভাতের হাঁড়ির কী হবে সেই নিয়ে তৃণমূলের কোনও মাথাব্যথা নেই। ভারত রাষ্ট্রের সংসদে পেশ হওয়া সংখ্যালঘু উন্নয়নের জন্য সাচার কমিটি ও রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশনের সুপারিশগুলো পশ্চিমবঙ্গে কীভাবে ও কতটা প্রয়োগ করা হল, তা নিয়ে কিন্তু রাজনৈতিক তর্জা হচ্ছে না। বরঞ্চ অসাংবিধানিক ইমাম ভাতা নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে আর বিজেপি হিন্দু পুরোহিতদের সঙ্গে ধর্মীয় সংখ্যাগুরু মানুষের একাংশকে তাতিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। রাজ্য রাজনীতির জন্য এগুলো অত্যন্ত বিপজ্জনক চিহ্ন। বাংলার ইতিহাসে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী রাজনীতির দীর্ঘ ঐশ্বর্য থেকে শিক্ষা নিয়ে, জোরদার শ্রেণী আন্দোলন এবং দলিত, আদিবাসী, সংখ্যালঘু ও মহিলাদের মৌলিক গণতান্ত্রিক দাবিগুলোকে সামনে রেখে সুদীর্ঘ জনআন্দোলন সংগঠিত করে ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিকে একসাথে মিলেমিশে রুখতেই হবে।

পৃথিবীতে যে দেশেই যে-কোনো বিভাগেই ক্ষমতা
অতিপ্রভূত হয়ে সঞ্চিত হয়ে ওঠে সেখানেই সে ভিতরে
ভিতরে তার মারণ বিষ উদ্ভাবিত করে।
ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম বলো, ফাসিজ্‌ম বলো, অন্তরে অন্তরে
নিজের বিনাশ নিজেই সৃষ্টি করে চলেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
কালান্তর, পৃ. ৩৭৩।